দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ … পৃষ্ঠা … কলাম …

অভিমত

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি

মেজর (অবঃ) আসলাম হায়দার *পিএসসি*

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠকে ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্ভবত খুবই সিরিয়াস এবং আন্তরিক। তিনি চাইছেন যেভাবেই হোক ক্যাম্পাস থেকে রাজনীতি দূরে সরে যাক। সেখানে সৃষ্টি হোক শান্ত, স্নিগ্ধ, লেখাপড়ার পরিবেশ। বন্ধ হোক মস্তানি বোমা/বন্দুকবাজি, টেন্ডারবাজি এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম। আর কোন ছাত্র পড়তে এসে যেন লাশ হয়ে ঘরে ফিরে না যায়; তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা করছেন। মতামত নিচ্ছেন বিশেষজ্ঞগণের। তিনি এর আগে গত ২ ডিসেম্বর সংসদে ভাষণ দেয়ার সময় এ নিয়ে প্রথম কথা বলেন। তারপর গত ২৯ জুন বাজেট অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণে আবারও এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন পত্রিকায় এ বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক-কলামিস্টদের লেখা থাকছেই। পক্ষে-বিপক্ষে লিখছেন এসব স্বনামধন্য বিশিষ্টজন। বিবিসি থেকেও এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত প্রচার করা হচ্ছে। তা ছাড়াও দুই নেত্রী অর্থাৎ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বরও প্রচার করা হচ্ছে। সমগ্র দেশের বিভিন্ন পেশার লোকজনের মধ্যেও আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ছাত্র, শিক্ষক, চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শ্রমিক, কৃষক, রাজনীতিবিদ– কেউই বাদ নেই এ বিতর্কে অংশ নেয়া হতে।

বিষয়টি প্রথম সকলের গোচরীভূত করেন মাননীয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। রাষ্ট্রপতি থাকাকালে (আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায়) সে সময়ে তিনি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এ নিয়ে কথা বলতে থাকেন। তখনও বিতর্ক হয়েছে। তবে তেমন জোরালোভাবে নয়। কারণ সবাই একটি বিষয়ে পরিষ্কারভাবে অবগত আছেন যে, এ দেশে রাষ্ট্রপতির তেমন ক্ষমতা নেই। সংবিধান অনুযায়ী তিনি একজন 'Yes Man' মাত্র। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মাজার জিয়ারত এবং কোন সভা-সমাবেশে ডাকা হলে সেখানে গিয়ে দাওয়াত রক্ষা করাই তার অন্যতম কাজ। সুতরাং তিনি যা-ই বলেন না কেন, যত হুমকি-ধমকিই করুন না কেন, তাঁর কথাগুলো বক্তৃতা-বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশের সরকারপ্রধান এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই হবার নয়।

জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এক সময় তিনিও তাঁর ছাত্র দলের ছাত্র সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মকাণ্ড বেশ কিছু দিন স্থগিত রেখেছিলেন। তারপর হয়ত বা তিনি এক সময় বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্নও ছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর ছাত্র সংগঠনের উচ্ছৃঙ্খল কার্যক্রম দেখে ছাত্রদলের ওপর চরম নাখোশ হয়েছেন। তাই তিনিও ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড আপাতত বন্ধ রেখেছেন। সিরিয়াসভাবে চিন্তাভাবনা করছেন ক্যাম্পাসে রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে। অতি সম্প্রতি বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যাকাণ্ড, সম্ভবত তাঁকে আরও উদ্বিগ্ন করেছে। ছাত্ররা বর্তমানে যেভাবে উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল, অমানবিক এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে, তাতে সত্যিই দেশ ও জাতির জন্য এক অশুভ সঙ্কেত। জাতির জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি মোটেই সুখকর নয়।

আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ছাত্ররাই এদেশের রাজনীতির গোড়াপত্তন করে; ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামের প্রথম ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ছাত্রদের এই সংগঠনের ওপর ভিত্তি করেই '৪৯-এর জুন মাসে জন্ম নেয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ নামের প্রথম পরিপূর্ণ রাজনৈতিক দল। এ দলের প্রথম সারিতে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম, ভাসানী, বঙ্গবন্ধুসহ আরও অনেক বরেণ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ আমাদের স্বাধিকার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু এ সব কিছুরই অগ্রপথিক ছিল আমাদের তরুণ ছাত্ররা। বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং স্বাধিকার আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে পৃথকভাবে আবার কখনও অভিন্ন কর্মসূচী দিয়ে আন্দোলনকে বেগবান করেছে তারা। ছাত্রদের স্বাধীনতাপূর্ব ভূমিকা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। সাধারণ মানুষের কাছে ছাত্ররা ছিল আদর্শের মূর্ত প্রতীক। সমাজের কোন অন্যায়-অবিচারই তারা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়নি। ছাত্রনেতারা ছিলেন সৎ, মেধাবী, আদর্শ মানুষ। ছাত্ররা আজকের মতো রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক হিসাবে কাজ করেনি। দেশের ক্রান্তিলগ্নে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোন দলের নেতা-নেত্রীর ওপর তাদের নির্ভর করতে হতো না। তাই তো '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, সামরিক আইনবিরোধী আন্দোলন, ছয় দফা, গণঅভ্যুত্থান, স্বাধীনতাযুদ্ধ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ছাত্ররাই পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা।

সেই ছাত্ররাই স্বাধীনতাউত্তর হয়ে ওঠে উচ্ছৃঙ্খল, উগ্র। এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে ছাত্র রাজনীতি। রাজনীতিতে তৈরি হয় সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী। জিয়া আইন করে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত করেন ছাত্রদের সংগঠনকে। অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে নৈতিকতা হরণ করা হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, ধরন-ধারণ বদলে ছাত্ররা চরিত্র বদলে ফেলে। শুরু হয় টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মস্তানি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এরই জের ধরে জে. এরশাদও চেয়েছিলেন ক্যাম্পাসে তাঁর রাজনৈতিক শিষ্য তৈরি করতে। কিন্তু তিনি সফল হননি। তাঁর সৃষ্ট সংগঠন 'ছাত্রসমাজ' কখনই সফলতার মুখ দেখেনি। তাই তিনি নিজেও আইন করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে ছিলেন। ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে শিক্ষকরাও পিছিয়ে নেই। শিক্ষকরা রাজনীতি করেন কোন আদর্শের জন্য নয়। তারা রাজনীতি করেন নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে ছাত্রদের সাথে নিয়ে তারা নিজেদের পদোন্নতি, বিভিন্ন পোস্ট, স্কলারশিপ, লোভনীয় কোন পদ দখল করার জন্য বর্ণিল হন– কেউ সাদা, কেউ নীল অথবা হলুদ কিংবা গোলাপী। নিজেদের স্বার্থে ক্যাম্পাসে অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছেন এই শিক্ষকরা। এমন একজন শিক্ষক নাকি শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিচয় থাকার কারণেই পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী থাকা সত্ত্বেও ঢাকা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হয়েছিলেন। শিক্ষকরা রাজনীতি করলে অনেক সুবিধা ভোগ করতে পারেন। যেমন ঠিকমতো ক্লাস নিতে হয় না, পরীক্ষা সময়মতো না নিলেও চলে, দীর্ঘদিন ছুটি ভোগ করা যায়, বাইরে সফর করে বিভিন্ন কাজ করে পয়সা কামানো যায়, সরকারী ডাক্তারদের মতো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ব্যবসা করা যায়। ছাত্রদের বারোটা বাজুক, তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না। গরিব মা-বাবার ছেলেমেয়েগুলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে সময়মতো শিক্ষাজীবন শেষ করে কোন পেশায় ঢুকে পড়ার জন্য। অর্থ উপার্জন করে মা-বাবার হাতকে শক্তিশালী করা, তাদের অবসর দেয়া। কিন্তু তা হয় না। অভিভাবকরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ [illegible] যুগের পর যুগ খরচ করতে থাকেন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ছাত্রত্ব আর ঘোচে না। কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ, শিক্ষক এবং সন্ত্রাসী ক্যাডারদের হাতে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রম জিম্মি হয়ে আছে। গুটিকয়েক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং রাজনীতিবিদ ছাড়া আর কেউই এসব অবস্থা চলতে থাকুক, তা চান না।

ছাত্ররাজনীতিকে দলীয় লেজুড়বৃত্তির আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার জন্য সংগঠনের কমিটি নির্ধারণ করে দেন রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা। এ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতি একান্ত অনুগত ছাত্রদের বেছে নেয়া হয়। যাতে নেতানেত্রীর সিদ্ধান্তের বাইরে নিজেদের অর্থাৎ ছাত্রনেতাদের নিজস্ব কোন বিবেক-বিবেচনা না থাকে। তাদের চোখ এবং হাত-পা থাকবে বাঁধা। এ হচ্ছে গণতন্ত্রের লেবাসে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক আচরণ। ছাত্রজীবনে গণতন্ত্র শিক্ষার ব্যর্থ এ সব নেতা ভবিষ্যতে দলের নেতা হিসাবে আর কখনই উদার গণতান্ত্রিক হতে পারেন না।

ক্যাডার রাজনীতির কোন আদর্শ নেই। ক্ষমতা বদলের সাথে সাথে ওরাও দলবদল করে। আসলে ওদের প্রয়োজন নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আর তা হলো সরকারী দল। সরকারী দলের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে ওরা বেড়ে ওঠে, নির্বিঘ্নে চালিয়ে যায় ওদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড। মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে জিম্মি করা, রেপ, চাঁদাবাজি, এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রবাজি করে দলীয় ব্যানারে ছাত্র নামধারী কিছু সন্ত্রাসী-মস্তান। শিক্ষক রাজনীতির ফলে পুলিশ গভীর রাতে মেয়েদের হলে ঢুকে পড়ে। অমানবিকভাবে লাঠিপেটা করে সাধারণ ছাত্রীদের। তার পরও ভিসি এবং তাঁর দলীয় সতীর্থরা মনে করেন এটা একটা ষড়যন্ত্র। তাই তিনি বত্রিশ দন্ত বিকশিত করে হাসতে পারেন। কারণ তিনি জানেন তিনি বর্ণহীন নন। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বর্ণহীন করা, রাজনীতি মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ : ১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিদ্যা অর্জনের স্থান। এখানে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাজীবন সময়মতো শেষ করে দ্রুত নিজ নিজ পেশায় ফিরে যেতে চান। রাজনীতিও একটি পেশা অন্তত আমাদের দেশে। রাজনৈতিক ক্যারিয়ার মানে ক্ষমতা, অর্থ-বৈভব। সুতরাং এই পেশায় যেতে হলেও পড়ালেখা শেষ করেই একজন ছাত্রকে সে জীবন বেছে নিতে হবে। অন্যদের অর্থ, সময় (বয়স), জীবনকে জিম্মি করে নয়।

২. একজন প্রকৃত শিক্ষানুরাগী বর্তমান প্রেক্ষাপটে কখনই রাজনীতিবিদ হতে চান না। টিভিতে মেধাবী ছাত্রদের ইন্টারভিউ দেখলেই তা বোঝা যায়। তা ছাড়া যারা ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত, তারা সবাই আমাদের পরিচিতজন। এই ছাত্ররা কখনই একজন শিক্ষানুরাগীর শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। ভবিষ্যতেও দলীয় রাজনীতিতে তার ভূমিকা একই হতে বাধ্য।

৩. আমাদের সংবিধান ভোটাধিকার প্রয়োগ অধিকার দিয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক একজন নাগরিককে। আর প্রাপ্তবয়স্ক তিনিই, যাঁর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী একজন ছাত্র ১৫ বছর বয়সে এসএসসি পাস করে। কলেজপড়ুয়া একজন ছাত্রের বয়স ১৫-১৭ বছর। সুতরাং কোন কলেজেই রাজনীতি করার অনুমোদন দেয়া উচিত নয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতেও নয়। যেখানে এইচএসসিপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশি।

৪. শিক্ষার্থীর জীবন একান্তই তার। তার আদর্শ, চিন্তাচেতনা দেশ ও জা[illegible]ধারণা, রাজনৈতিক মতাদর্শে কেউই প্রভাব ফেলতে পারে না। আমাদের দেশে বর্তমানে রাজনীতিতে এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই যার আদর্শে কেউ অনুপ্রাণিত হতে পারে। সুতরাং ছাত্রদের ধারণা, রাজনৈতিক মতাদর্শে বাইরের কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর পারে না বলেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রাধান্য পায় ক্যাম্পাসে। জোর করে সমর্থন আদায় করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। যার ফলে বন্দুকবাজি, বোমাবাজি হয় আন্তঃক্যাডার বাহিনীর মধ্যে।

৫. যে সমস্ত অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ক্যাম্পাসে পাঠান, তাঁরা চান রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ। যেখানে প্রতিষ্ঠানটি একদিনের জন্যও বন্ধ হবে না। শিক্ষা কার্যক্রমের ধারা অনুযায়ী শিক্ষাদান অব্যাহত থাকুক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত হবে কি-না, তা অনেকখানি নির্ভর করবে যাঁরা ছেলেমেয়ে পাঠাচ্ছেন শিক্ষার জন্য তাঁদের ওপর। প্রয়োজনে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত অভিভাবকের মতামত নেয়া যেতে পারে ভোটাভুটির মাধ্যমে।

৬. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার। সুতরাং ক্যাম্পাস রাজনীতিমুক্ত হবে কি-না, তা ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। প্রত্যেক ছাত্রেরই পরিচয়পত্র রয়েছে সুতরাং কারচুপির কোন সম্ভাবনা নেই।

৭. ক্যাম্পাসে যারা রাজনীতি চর্চা করতে চান সে সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীর জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নেতৃত্ব, বিদেশনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জ্ঞানদান করা যেতে পারে। এতে করে রাজনীতির প্রতি ঝোঁক আছে এমন শিক্ষকরাও মজা পাবেন, আবার ভবিষ্যত রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় দক্ষ জনশক্তিও গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ক্যাডার সন্ত্রাসী, মস্তানদের স্থানও এখানেই হতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল দীর্ঘদিন থেকেই মেধা[illegible] ছাত্রদের আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত হয়ে এসেছে। তবে এ হলের ছাত্ররা ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত বলে তা[illegible] দীর্ঘ ২১ বছর ('৭৫-৯৬) চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হ[illegible] এসেছে। এদের কোন ক্যাডার সার্ভিস বা সরকারী ভা[illegible] চাকরিতে নির্বাচিত করা হতো না। সুতরাং ক্যাম্পাস রাজনী[illegible] বন্ধ হলে এ ধরনের বৈষম্য দূরীভূত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজনীতিমুক্ত করা[illegible] যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর কেটে গেলেও আমাদের অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি[illegible] দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতির নামে যে সশস্ত্র মস্তানি চলছে, তাতে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলেই উদ্বিগ্ন। ভা[illegible] শিক্ষার্থীরা যাদের সচ্ছলতা আছে তারা সবাই দেশে অথব[illegible] বিদেশে প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছেন। অসচ্ছল গরিব পরিবারের মেধাবী ছাত্ররা যাদের বাইরে যাবার সামর্থ্য নেই; তারাই পড়ে আছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক পরিবেশে যে জগাখিচুড়ি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তাতে সমগ্র প্রশাসন, সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ইত্যাদি রাজনীতির মতো বিভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে এ অবস্থা হতে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিদেশে কোন শিক্ষাঙ্গনেই এমন দলীয় রাজনীতি অনুমোদন করে না[illegible] শিক্ষার্থীরা নির্মল পরিবেশে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে তাদে[illegible] শিক্ষাজীবন। তারপর যে যার মতো নেমে পড়ে জীবন সংগ্রামে[illegible] দেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ সকলকে গভীরভাবে বুঝতে হবে বিষয়টি। দেশমাতৃকার এ ক্রান্তিলগ্নে অন্যান্য দেশের ছাত্ররা যেমন ভূমিকা রাখে, আমাদের ছাত্ররা যেমনটি করেছে অতীতে, তেমনই কোন প্রয়োজনে তারা আবারও দেশ ও জাতির কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এই নষ্ট সময়টায় যেন শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি বন্ধ থাকে।